BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090014

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

চাঁদ ও কাস্তের প্রতীকে বাংলা কবিতা : কবি দিনেশ দাস ও অন্যান্যরা

চন্দন ভট্টাচার্য

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

Abstract:

'কাস্তে' কবিতাটি কবি দিনেশ দাসকে রাতারাতি খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে দিনেশ দাসের 'এযুগের চাঁদ হল কাস্তে' -এই পংক্তি নিয়ে কবিতা লেখেন, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্প লেখেন। কাস্তে কবিতায় কবি দিনেশ দাস বাঁকা চাঁদকে শ্রমজীবী কৃষকের ফসল-কাটার ক্ষুরধার অস্ত্র কাস্তের সঙ্গে তুলনা করেন। যে চাঁদ এতকাল কাব্যজগতে প্রেম ও সৌন্দর্যের লাবণ্যময় প্রতীক ছিল তাকে তিনি খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাসন্ন হলেও কবি মনে করেছেন শেল, বোমার ভার বেশি হলেও কাস্তের ধারের কাছে তারা তুচ্ছ। কেননা কাস্তে শুধু আত্মরক্ষার অস্ত্র নয়, ফসল কাটার অস্ত্র। তিনি চাঁদ নিয়ে পূর্ববর্তী কবিদের কবিতার গতানুগতিক রোমান্টিকতার মূলে আঘাত করেছেন। কবিতাটির ছন্দ ও অলংকারগত দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পরবর্তীতে কবি জীবনানন্দ দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখেরা চাঁদ ও কাস্তের প্রতীকে বিভিন্ন কবিতা লিখেছে, বিভিন্ন গণসংগীতও রচিত হয়েছে। কিন্তু দিনেশ দাসের কাস্তে কবিতাটি এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত।

Keywords: *কাস্তে, চাঁদ, দিনেশ দাস, কাস্তেকবি, এযুগের চাঁদ হল কাস্তে, বাংলা আধুনিক কবিতা, চল্লিশের দশক।*

Introduction:

একটি কবিতা লিখে রাতারাতি খ্যাতিমান হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সেদিক থেকে দিনেশ দাস বিরল সৌভাগ্যের কবি। তাঁর ১৯৩৭-এ লেখা 'কাস্তে' কবিতাটি রাজরোষের ভয়ে প্রথমে কেউ ছাপতে চান নি। ১৯৩৮-এ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় তা প্রকাশিত হলে পাঠক ও লেখক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কবিতাটিতিরিশের রোমান্টিকতা বর্জন করে বিপ্লবীচেতনার নান্দনিক প্রকাশ ঘটায়, চাঁদ নিয়ে উচ্ছ্বাস বিসর্জনের খাতায় নাম লেখায়।কবিতাটির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এমনই হয়েছিল, অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে 'এযুগের চাঁদ হল কাস্তে' নামে দুটি কবিতা লিখলেন। 'অলকা' পত্রিকায় ঐ শিরোনামেই প্রকাশিত হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প। একটি কবিতায় এই সিদ্ধি ঈর্ষণীয়। আসলে সামাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবিদের কাছে চাঁদ যখন 'বুর্জোয়াদের মায়া' কিংবা 'ঝলসানো রুটি' মাত্র, তখন সেই চাঁদ প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে ওঠায় এমন সদর্থক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

Discussion:

এক জটিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দিনেশ দাসের সাহিত্য সচেতনতা গড়ে উঠেছিল।বিগত শতকের তিরিশের দশকে রবীন্দ্র কাব্যধারার পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অথবা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবনার বিস্তৃত ছত্রছায়ার প্রভাব থেকে মুক্তির সন্ধানে কল্লোলগোষ্ঠির কবিরা এক নব্য-ভাবধারার আন্দোলন শুরু করেন। সেই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং কিছুটা সমর সেন প্রমুখ কবিরা। তাঁরা চিরাচরিত প্রেম এবং প্রকৃতি থেকে সরে এসে কবিতাকে সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত করলেন। তার সার্থক ফসল হল বামপন্থী মতবাদের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ (১৯৪১)। যেখানে মেহনতী মানুষের যাপনচিত্র ছিল মুখ্য বিষয়।

পরবর্তী চল্লিশের দশক সংযুক্ত বাংলার (অন্তত ১৯৪৭ পর্যন্ত) জন্য এক দুঃস্বপ্নের দশক ছিল। ভীষ্ম পিতামহের মতো বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দীর্ঘ প্রতিপালনের পর কবিগুরু প্রয়াত হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষ একেবারে সদর-দরজায় এসে হানা দিয়েছিল। মানুষের কদর্য লালসা আর স্বার্থপর লোভের পরিণতিতে মানুষেরই তৈরি দুর্ভিক্ষে যাপঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩)নামে কুখ্যাত, তাতেকয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং সর্বোপরি ১৯৪৬-এ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও স্বাধীনতা পূর্ব দেশ বিভাজনের ফলে উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কিত পরিস্থিতির চাপে মৃত্যু হয়েছিল মানুষের শুভবুদ্ধি ও সুকুমার বোধের। প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতাই এসে দাঁড়িয়েছিল এক চরম সংকটের মুখে।

কবি দিনেশ দাস এই আবর্ত-সংকুল সময়খণ্ডের এক উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর কাব্যচেতনাকে প্রভাবিত করেছিল এই সমস্তকিছুই। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত যাপনের চালচিত্র।নবম শ্রেণীতেপড়ার সময় মাত্র পনেরো বছর বয়সে (১৯২৮) মহাত্মা গান্ধীর লবণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে সাময়িকভাবে লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে। একবছর বাদে আবার শিক্ষার জগতে ফিরে এসে ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩২তে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। ১৯৩৩-এ বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেও সেই বিপ্লবী আন্দোলন এবং সাহিত্যচর্চার জন্য গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারেন না। ১৯৩৩-এ দেশ পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫-এ খয়েরবাড়ি চা-বাগানে চাকরির সূত্রে কার্শিয়াং চলে আসেন। সেখানে গান্ধীবাদী মতাদর্শের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৬-এ বামপন্থী মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, রালফ ফক্সের রচনা পাঠ করে এক নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। এই চিন্তামানসই তাঁর কবিতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে আমৃত্যু।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়াজাগানো 'কাস্তে' কবিতা। এই কবিতাটি আধুনিক বাংলা কবিতার এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় এবং তিনি প্রায় রাতারাতি মেহনতী মানুষের জীবন-যন্ত্রণা প্রকাশের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। 'কাস্তে' কবিতায় শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদটাকে তিনি শ্রমজীবী কৃষকের ফসল-কাটার ক্ষুরধার অস্ত্র কাস্তের সঙ্গে তুলনা করেন। যে চাঁদ এতকাল কাব্যজগতে প্রেম ও সৌন্দর্যের লাবণ্যময় প্রতীক ছিল তাকে তিনি খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুললেন। এমন একটি বৈপ্লবিক চিন্তার তিনিই পথিকৃৎ।

কবিদিনেশ দাস 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"১৯৪১। হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ। কলকাতার ডক-অঞ্চলে প্রথম জাপানী বোমা নিক্ষিপ্ত হ'ল। সারা পৃথিবী তখন ফ্যাসিস্টদের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমাদের দেশের শতকরা নব্বইজন তো হিটলারকে ভগবানের অবতার বলেই মেনে নিলেন। ঢাকা-রমনায় ব'সে কবি মোহিতলাল মজুমদার পর্যন্তও এই মতের প্রতিধ্বনি করলেন। কবি-মনীষী দত্তেরও মনে সংশয়: 'It is difficult to choose between Communism and Fascism.' সেই স্থির বিশ্বাসের কবিতা 'কাস্তে'। এতে বলতে

চেয়েছিলুম- জার্মান-ফ্যাসিস্টদের বেয়নেট যত তীক্ষ্ণই হোক না কেন, কাস্তে-হাতুড়ি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে তারা পাঞ্জা লড়তে পারবে না। তাই ঘটল।"[১]

ভূমিকায় 'কাস্তে' কবিতার ইতিহাসও তিনি লিখেছেন—

"১৯৩৭ সালে রচিত হল 'কাস্তে'। কিন্তু হাতুড়ি বর্জিত করা সত্ত্বেও রাজরোষের ভয়ে কোনও সম্পাদক কবিতাটি প্রকাশ করতে চাইলেন না। ফলে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম। কারণ কবির প্রকাশ কবিতা। এই প্রকাশের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্ব। তা যদি খণ্ডিত হয় তাহ'লে কবিতা রচনা ক'রে কী লাভ। অবশেষে এক বছর পরে কবি অরুণ মিত্রের সৌজন্যে 'কাস্তে' কবিতাটি প্রকাশিত হয় শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৯৩৮)। কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী-গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে ওই কবিতাটির ছত্র 'এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে' উদ্ধৃতি দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকায় দু'টি সার্থক কবিতা লিখলেন। তখনই কবি মহলে সাড়া পড়ে যায়। অগ্রজ কবিদ্বয়ের অনুসরণে এই ছত্রটিকে শিরোনাম ক'রে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ সেকালের তরুণ কবিরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা রচনা করেন। 'এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে' নামে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছোটগল্পও 'অলকা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য 'কাস্তে' কবিতাটি শুধু আমার জীবন নয়, 'বাংলা সাহিত্যে একটি ঘটনা'।"[২]

পাঁচটি স্তবকে, ২০ পংক্তিতে লেখা 'কাস্তে' কবিতায় দিনেশ দাস তাঁর প্রতিবাদী ও মানবতাবাদী মনোভাব চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। প্রথম স্তবকেই তাঁর প্রত্যয় ও সংগ্রামী চেতনা মূর্ত হয়েছে—

"বেয়নেট হোক যত ধারালো-
কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু!"[৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাসন্ন। তারই পটভূমিতে কবি তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বেয়নেটধারীরা যতই শক্তিমান হোক, তা ধ্বংসের প্রতীক।সেই অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমদানিকৃতঅস্ত্রে যুদ্ধ করা যায় না। নিজস্ব হাতিয়ার কাস্তেই সেখানে ভরসা। যে বিজ্ঞান মানবকল্যাণে নিযুক্ত নয়, তা চিরজীবী হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজদের পতন তাই নিশ্চিত।মাটির কাছের মানুষ যারা, সেইসব কৃষকদের কবি প্রস্তুত হতে বলেন এইসব দানবের সাথে সংগ্রামের লক্ষ্যে। শেল, বোমার ভার বেশি হলেও কাস্তের ধারের কাছে তারা তুচ্ছ। কেননা কাস্তে শুধু আত্মরক্ষার অস্ত্র নয়, ফসল কাটার অস্ত্র। যে ফসল ক্ষুধার সামগ্রী। কৃষকেরা সেই ফসল রক্ষা করে এবং তাই তারা মানবসভ্যতারও রক্ষক।

'কাস্তে' কবিতা আমাদের মনে এই প্রত্যয় জাগায়, কৃষিনির্ভর এই বঙ্গদেশে কৃষি-সভ্যতার বিকল্প নেই। তারই প্রতীক কাস্তে যেকোনো বাধা-বিঘ্ন, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে অনায়াসে রুখে দাঁড়াতে পারে। কেননা সে প্রাণহরণ করে না, বরংপ্রাণ বাঁচাবার উপায় বের করে শস্য বা ফসল কেটে ক্ষুধাতৃপ্তির ব্যবস্থা করে। আর এই কাস্তে যাদের হাতিয়ার সেইসব কৃষকদল মেহনতী মানুষ। কবি তাদের বন্ধু বা সংগ্রামের সঙ্গী ভাবেন। তাই রূঢ় বাস্তবে চাঁদের মায়ায় আচ্ছন্ন না থেকে চাঁদকেই হাতিয়ার বানাবার ডাক দেন। যন্ত্রসভ্যতা বা আণবিক যুগের পরিচালকেরা ভেবেছিল বারুদই শক্তির উৎস। কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখিয়েছে এই শক্তির পরীক্ষা কত সর্বনাশা—

"ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া
কাল যারা করেছিল পূর্ণ,
কামানে-কামানে ঠোকাঠুকিতে
আজ তারা চূর্ণবিচূর্ণ"[৪]

মানবসভ্যতা ধ্বংস করায় কোনো কৃতিত্ব নেই। তাই কবিসৃষ্টির আহ্বান জানান, মাটির কাছে আসতে বলেন সকলকে। কেননা জন্ম-মৃত্যু-সৃষ্টি সব কিছুর ধারক-বাহক এই মাটি—

"দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই! চেয়ে দ্যাখো বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা, বন্ধু!"(৫)

শেষ পর্যন্ত 'কাস্তে' কবিতায় কবির শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা ও আস্থা প্রকট হয়েছে দেখা যায়। তিনি বিশ্বাস করেন যুদ্ধ, শক্তি-দম্ভ কিছুই চিরন্তন নয়। মানুষ এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে এবং এই পৃথিবীর প্রতি তার দায় আছে। সুতরাং সেই ধুলোমাটির পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে, শস্যশ্যামলা করে তুলতে হবে। আকাশে নয়, তাকাতে হবে মাটিতে। চাঁদ নয়, কাস্তে হবে এই শতকের প্রতীক।দ্বিতীয় স্তবকে তাইচাঁদ নিয়ে উনিশ শতকীয় রোমান্টিকতা এবং রবীন্দ্রোত্তর তিরিশ দশকের কবিদের ভাবালুতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

"নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে!"(৬)

চাঁদের সঙ্গে প্রিয়ার মুখ, বুকের তুলনা কিংবা চাঁদের আলোয় মৃত্যু কামনার রোমান্টিকতা অনেক দেখা গেছে। কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছেন—

"আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে
আধখানা চাঁদ নিচে
প্রিয়া তব মুখে ঝলকিছে"(৭)

জীবনানন্দও একসময় 'আমি যদি হতাম' কবিতায়দেখেছেন সোনার ডিমেরমতো চাঁদ—

"শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।"(৮)

বাঁকা চাঁদের আড়ালে কঙ্কাবতীকে নিয়ে নিভৃত প্রণয়সুখ পেতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু—

"আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে : মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা
জলে, মেঘের রেখায়
এক বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায়"(৯)

—এমন চন্দ্রাহত যুগ এই যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীতে কাম্য নয় বলেই দিনেশ দাস লেখেন—

"চাঁদের শতক আজ নহেতো
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।"(১০)

দূর আকাশের চাঁদ মায়াবী; কিন্তু কাস্তে সত্য এবং নিজস্ব অধিকারের বোধ জাগিয়ে তোলে। এই শতক যেমন যুদ্ধের, তেমনি প্রতিরোধের।তাই তৃতীয় স্তবকে যুদ্ধপাগল পৃথিবীর দুর্দশার চিত্র আঁকা হয়, যেখানে ইস্পাতে, কামানে, বারুদে, রক্তে সবুজ ঘাস, নরম মাটি ক্লেদাক্ত,'কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে' সব চূর্ণবিচূর্ণ। বিশ্বযুদ্ধের এই ট্র্যাজিক পরিণতি সভ্যতার অগ্রগতি বোঝায় না। মানুষের মঙ্গল করে না। এক মানবিকবোধহীন বণিকসভ্যতা চতুর্থ স্তবকে এভাবেই চিহ্নিত হয়—

"চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে"(১১)

—এখানে 'লৌহ-পৃথিবী' যেমন শক্তিমত্ত ফ্যাসিস্টদের বোঝায়; তেমনি হৃদয়হীন সভ্যতাকেও ইঙ্গিত করে। অবশ্য ধ্বংসের মধ্যে যেমন সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে, তেমনি রক্তসমুদ্র মাটিকে উর্বরা করে যে পৃথিবী রণ-রক্তে বিচূর্ণ, তাই 'গলে পরিণত হয় মাটিতে।' সব কিছুর উপরে মাটিই সত্য-যা আশ্রয় দেয়,ফসল ফলায়। কবির ভাষায় 'মাটির-মাটির যুগ ঊর্ধ্বে' এই রক্ত, যুদ্ধ। 'মাটির যুগ' আসলে মাটির প্রতি অধিকার বোধ। প্রকৃতির দান যে মাটি তাতে সকলের সমান অধিকার মনে রাখতে হবে।সুতরাং পঞ্চম স্তবকে কবি ঘোষণা করেন—

"দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই! চেয়ে দ্যাখো বন্ধু।"(১২)

আকাশ-বাতাস যারা গুলি-বারুদে ভরে দিয়েছিল, তাদের প্রতি কবি তাঁর বিশ্বাসের জয় ইঙ্গিত করেন। 'মাটির যুগ' কিংবা 'দিগন্তেমৃত্তিকা ঘনায়ে আসে' বলার মধ্যে এই মাটি ও মানুষের প্রতি প্রেম দ্যোতিত হয়েছে। কবি যেন রাবীন্দ্রিক বিশ্বাসে বলতে চান, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ আর যুদ্ধজয়ের উন্মাদনার পরেও ওরাকাজ করে।কবির প্রশ্ন, একদিন যুদ্ধ শেষ হবে, ধ্বংসদীর্ণ পৃথিবীতে নতুন জীবন সৃষ্টি হবে। তখন—

"কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ মাটির কাস্তেটা, বন্ধু!"(১৩)

'মাটির কাস্তে' —এই উচ্চারণে কবি বুঝিয়ে দেন, যা ছিল ধ্বংস, হিংসার বা হত্যার অস্ত্র, তা হবে প্রতিরোধের ও প্রাণ-ধারণের হাতিয়ার। যেমন কবি ভ্লাদিমিরমায়াকোভস্কি তরবারি ভেঙে লাঙল গড়ার কথা বলেন।দিনেশ দাসও হত্যার অস্ত্রকে উজ্জীবনের আধার করতে চান।

'কাস্তে' কবিতাটির প্রতিটি পংক্তি একাদশ অক্ষরে গাঁথা হলেও মূলত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। ৬মাত্রার মাত্রাবৃত্তে ছাড়াও ৪মাত্রার মাত্রাবৃত্তে কবিতাটি পড়া সম্ভব। যেমন—

বেয়নেট হোক / যত ধারালো (৬+৫)

কাস্তেটা ধার দিয়ো বন্ধু (৬+৫)

অথবা ঝোঁক দিয়ে দ্রুত পড়া যায়—

শেল আর / বোম হোক / ভারালো (৪+৪+৩)

কাস্তেটা / শান দিয়ো / বন্ধু। (৪+৪+৩)

শব্দ চয়নে কবি তৎসম অপেক্ষা তদ্ভব শব্দ ব্যবহারে আগ্রহী। তাই 'ধারালো', 'শান', 'চাঁদ', 'বাঁকা', 'মাটি' ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায়। তবে 'শতক', 'মৃত্তিকা', 'দিগন্ত', 'উর্ধ্বে', 'সমুদ্র' ইত্যাদি তৎসম শব্দও প্রয়োজনে গ্রহণ করেছেন। আবার'বেয়নেট', 'শেল', 'বম', 'ইস্পাত' ইত্যাদি বিদেশি শব্দ প্রয়োগে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ছোট কবিতাটি অলঙ্কার অল্প হলেও সুমিত প্রয়োগে উজ্জ্বল। যেমন, 'চাঁদের শতক আজ নহে তো / এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে'-নিশ্চয় অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। কিংবা 'তোমাদের রক্তসমুদ্রে' রূপক অলঙ্কার বলা যায়। অবশ্য 'দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে আসে ওই' -সমাসোক্তি অলঙ্কার ব্যবহারের কৌশলী উদাহরণ। দিগন্ত ও মৃত্তিকা নর ও নারীর আলিঙ্গনের আভাসে অপূর্ব কাব্যশ্রী পেয়েছে।

স্মরণীয় উক্তি বা মেমোরেবল স্পীচকে অডেন কবিত্বের নিদর্শন বলেছিলেন। দিনেশ দাসের 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' এমনই এক স্মরণীয় পংক্তি বলা যায়। কাস্তের সঙ্গে চাঁদকে উপমিত করায় কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। যা 'রাজা' নাটকে পদ্মের ভিতরে বজ্রর মিলনকে মনে পড়ায়। কোমল ও কঠিনের এই মিলন বা দ্বন্দ্ব 'কাস্তে' কবিতার কাব্যরস ঘনীভূত করেছে।

কাস্তে-হাতুড়ির সমন্বিত প্রতীকে মার্ক্স-এঙ্গেলসের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক দর্শনের লক্ষ্য ছিল শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীবৈষম্যের অবসান ঘটাতে শ্রেণীসংগ্রামী বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক-জনতার মুক্তি, সেইসঙ্গে সমাজবদল, সংস্কৃতির চরিত্রবদল ঘটানো। উনিশ শতক (১৮৪৮) থেকে এ-আহ্বান বিশ্বসাহিত্য-সংস্কৃতির বুদ্ধিজীবী সমাজে বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগায়। ইউরোপ থেকে এশিয়ায়, এবং বিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমন্ডলে। তিরিশের দশকে প্রগতি সাহিত্যের সূচনায় মার্ক্সবাদী দর্শনের নান্দনিক প্রতীকগুলো ক্রমান্বয়ে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের চেতনা স্পর্শ করে, বিশেষ করে কবিতায় সৃজনশীলতায় প্রভাব রাখে। কাস্তে-হাতুড়ি কৃষক-শ্রমিকের সংগ্রামী সত্তার প্রতীক। কৃষিপ্রধান দেশ বঙ্গে কাস্তেরই প্রতীকী-প্রাধান্য নানা প্রতীকী উপমায়, কখনো চাঁদের সঙ্গে, যে-চাঁদ সাধারণত রোমান্টিক প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবেও কবিতায়-গানে ব্যবহৃত। তিরিশের দশকের শেষের দিকে ও চল্লিশের দশকে বাঙালি কবিদের যাঁরা চাঁদ ও কাস্তের উপমায় নান্দনিক প্রসাদ সৃষ্টি করে পাঠককুলকে চমকে দিয়েছিলেন, এই দিনেশ দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেখানে বিপ্লব নয়, ছিল প্রগতিচেতনার কাব্য-নান্দনিকতার সংগ্রামী প্রকাশ চাঁদকে কাস্তের প্রতীকে তুলে ধরা।

শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে 'এযুগের চাঁদ হল কাস্তে' -এই পংক্তি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সুধীন্দ্রনাথ কলাকৈবল্যবাদী, ফরাসি শব্দবাদী কবি মালার্মের অনুসারী। মালার্মের কাব্যাদর্শই তাঁর অন্বিষ্ট। 'উৎকৃষ্ট কবিতার' শৈল্পিক সমঝদার নান্দনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ কাস্তের অনুষঙ্গে কবিতা লেখেন তাঁর শিল্পবোধের সমান্তরালবর্তিতায়। কবিতাটি ছাপা হয় বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়। খানিক অবিশ্বাস্যই ঠেকে 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' পংক্তিটি নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নান্দনিক মাত্রায় কাব্যতৎপরতা। বিষ্ণু দে কাস্তের সংগ্রামী কাব্যধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন কিছুটা দেরিতে, 'সন্দ্বীপের চর'-এ পৌঁছে। 'মৌভোগ' কৃষক সম্মেলনের কথা স্মরণে রেখে ঐ শিরোনামের কবিতাটি সংগ্রামী ধারায় রচিত, যদিও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা-বিরোধিতা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ—

"তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান।"[১৪]

মনে রাখতে হবে, তিরিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতি, বিশেষভাবে বঙ্গীয় রাজনীতি বিপ্লবী ধারায় একটি রক্তাক্ত সংগ্রাম এবং আত্মদানের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। সূর্য সেন, প্রীতিলতা, যতীন দাস থেকে বিপ্লববাদীরা বক্সা-হিজলি ক্যাম্পে বন্দিদশায়, গুলি-মৃত্যুর ঘটনাবলি, যা রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করে, যা তাঁর কবিতায়ও প্রকাশ পায়। কাস্তের প্রতীকে রোমান্টিক চাঁদকে সংগ্রামী ভুবনে টেনে এনে লেখা একটি কবিতা তিরিশের দুই বিপরীত ধারার কবিকে এতটাই স্পর্শ করে যে, তার প্রকাশ ঘটে তাঁদের সচেতন কাব্যপংক্তিতে। অবশ্য দুজনকে দুই তাৎপর্যে। বিষ্ণু দে এর প্রকাশ ঘটান কৃষক-শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রামের ধারায় নান্দনিকতা অক্ষুন্ন রেখে। সেটা অবশ্য চল্লিশে পৌঁছে, গোত্রান্তর পর্যায়ে।

কবিতায় প্রথম দিকে হালকা চালে দিনেশ দাসের পংক্তির মতো করেই সামাজিক অনাচারী চরিত্রের চিত্র আঁকেন বিষ্ণু দে—

"আকাশে উঠল ওকি কাস্তে না চাঁদ
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে!
জুঁইবেলে ঢেকে দাও ঘন অবসাদ,
চলো সখি আলো করো ভাঙা নেড়া ছাদ।"(১৫)

—এজাতীয় হালকা চটুলতার পাশাপাশি একই কবিতায় একই সঙ্গে তিনি সামাজিক সচেতনতার পরিচয়ও রাখেন এই বলে—

"ঠগেরা বেনেরা পাতে চশমের ফাঁদ।
স্বার্থ-ছিটায় মুখে মৃত্যুর স্বাদ,
চাঁদের উপমা তাই কাস্তে।
--- --- --- --- ---
হৃদয়ে হাতুড়ি ঠোকে প্রেম, ওঠে চাঁদ
এ যুগের চাঁদ বাঁকা কাস্তে॥"(১৬)

পর্বান্তরে ভিন্ন এক বিষ্ণু দে জনজোয়ারের টানে তেভাগার কাব্যচর্চায় এবং কৃষক-আন্দোলনের পটভূমিতে কাস্তের সংগ্রামী ভূমিকাকে কাব্যপংক্তির নান্দনিকতায় প্রকাশ করেছেন এবং তা নানা অনুষঙ্গে। তাতে প্রকাশ পেয়েছে কাস্তের শৈল্পিক ব্যবহার—

"তোমার বাউলে মিলাই বন্ধু কাস্তের মেঠো স্বর
মানব না বাধা কেউ
ঘৃণা আর প্রেমে ক্রান্তিতে চাই জীবিকার অবসর
জীবনের তটে জোয়ারভাটার ঢেউ।"(১৭)

—এসব কাব্যপংক্তি বিষ্ণু দে-সুলভ ভিন্ন এক শিল্পচরিত্রের প্রকাশ ঘটায় -যা দিনেশ দাসের 'কাস্তে' থেকে অনেকটাই দূরে।সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপংক্তিতে বিষ্ণু দে থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাব্যবোধের প্রকাশ, যদিও বিষয়বস্তু একই- চাঁদ ও কাস্তে। এতে সংগ্রামীচেতনা নয়, শৈল্পিকচেতনারই প্রাধান্য। তবু কলাকৈবল্যবাদী কবি অশান্ত বিশ্বপরিস্থিতির উন্মাদনাকে শিল্পের ধোঁয়াশায় ঢেকে ভিন্ন এক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটান, যাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে না। সুধীন্দ্রনাথের 'কাস্তে' একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের। এর শুরুটা এরকম—

"আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকাল আসতে আসতে।"(১৮)

—কবিতাটিকে সুধীন্দ্রনাথ-সুলভ কাব্যশব্দবন্ধের জটিলতায় গতি করে উপসংহারে মানবিক চেতনার পক্ষে সংগ্রামী আভাস রেখেছেন শেষ কয়েকটি চরণে। সেখানে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নৈতিক সংগ্রামে কাস্তের ইতিবাচক ভূমিকার প্রশ্নবোধক প্রকাশ রেখেছেন পৌরাণিক সূত্রের অনুষঙ্গে। উল্লেখ্য, অশুভ শক্তির প্রবলতার প্রসঙ্গে শুভ শক্তির আভাস—

"শুষ্ক ক্ষীরোদ সাগরে মগ্ন বিষ্ণু
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু।
--- --- --- --- --- ---
খড়্গাবে কবে অমৃতের অপরাধ
কালপুরুষের কাস্তে?"(১৯)

কবিতাটির সমাপ্তি অবশ্য ইতিবাচক প্রত্যাশায় সময়ের ওপর চোখ রেখে, তবু সংশয়ের প্রশ্নটি থেকেই যায়। অমৃতের অপরাধ তো শ্রেণীগত চরিত্রের। যতদিন প্রতীকী সুরাসুরের দ্বন্দ্বে সুরের চাতুর্য ও শক্তি লড়াইয়ের মাধ্যমে পরাজিত না হবে, ততদিন নিম্নবর্গীয়দের অমৃতের ন্যায্য অধিকার অর্জিত হবে না। এভাবেই কবি সুধীন্দ্রনাথের প্রতীকে ঢাকা প্রগতিশীলতা শৈল্পিক প্রাধান্যকে অতিক্রম করে মাঝেমধ্যে বিরল কাব্যপংক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সেখানে তিনি যথার্থ বাস্তববাদী শিল্পী।

প্রসঙ্গত উল্লেখও যে, কবি জীবনানন্দ দাশও কাস্তেকে উপজীব্য করে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) কাব্যে 'পিপাসার গান' নামক কবিতায় লিখেছিলেন—

"কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
ঢালিয়াছে আলো।"(২০)

কবি সমর সেন অসুস্থ সমাজ, দূষিত সমাজ, বিকৃত মূল্যবোধে ও অবক্ষয়ে জীর্ণ নাগরিক সমাজের বিশ্লেষণে সমাজজীবনের চেয়ে ব্যক্তিক আচরণের জীবন বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দেন মূলত প্রেমকে ভিত্তি করে। সেখানে তারুণ্যে, যৌবনে ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন প্রাধান্য পায়, সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় অশান্ত চেতনার অস্থিরতায়। দিনেশ দাস থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে যেখানে চাঁদকে দেখেন শাণিত কাস্তের মতো, সমর সেনের চোখে তার ভিন্নরূপ। তাঁর ভাষায়—

"আজো জ্বলন্ত খড়্গের মতো আকাশে
চাঁদ ওঠে,
আজো সামনে
মৃত্যুর মতো মন্থর জীবন।"(২১)

—যে খড়্গো কোনো রোমান্টিক উপলব্ধির অবকাশ নেই, নেই কোনো সংগ্রামেরও। আছে খড়্গাঘাতে নাগরিক জীবনে অনিবার্য মৃত্যুর উপলব্ধি। পরবর্তী জীবনে রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী ফ্রন্টিয়ার সম্পাদক সমর সেন তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বে চাঁদকে কাস্তের প্রতীকে দেখেননি। দেখেছেন ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে 'জ্বলন্ত খড়্গের' প্রতীক রূপে, যে খড়্গের কাজ হলো জীবনকে কেটে ছিন্নভিন্ন করা।

চাঁদ-কাস্তে বা শুধুমাত্র কাস্তে নিয়ে কবিতার আদর্শিক সংগ্রাম চালানো বা রূপচিত্র আঁকার চেষ্টা করেননি দিনেশ দাস বাদে কোনো কবি। এ-চর্চাটা চলেছে চল্লিশের দশকে। সুভাষ-সুকান্ত থেকে বিষ্ণু দে প্রমুখের হাতে। আর গণসংগীতে বিশেষভাবে স্বনামখ্যাত সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ গুণীজন। শেষোক্তদের প্রভাব পঞ্চাশের দশকেও পূর্ববঙ্গের তরুণ-রাজনীতিমনস্ক সমাজে ব্যাপক পরিসরে দেখা গেছে।চল্লিশের দশকে মূলত সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য কাস্তেকে কৃষকজীবনের রূপচিত্রণে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে শ্রেণীসংগ্রামের শৈল্পিক তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন। সেই সঙ্গে সেই দশকের উল্লেখযোগ্য কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ একই পথে পা বাড়িয়েছেন। সেখানে চাঁদের রোমান্টিক প্রতীক বা আবহ প্রায়শ অনুপস্থিত।

শ্রেণীশাসন, শোষণ এবং এর বিপরীতে শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীশত্রু খতমের আহ্বান ছিল সুভাষের কবিতার একটি পার্শ্বমুখ। কৃষক-আন্দোলন, তেভাগা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষের কবিতায় কাস্তে নানা মাত্রায়, নানা ভাষ্যে বারবার এসেছে, ক্বচিৎ শিল্পের নম্রমাধুর্যে। গ্রামীণ পরিবেশের চিত্রণে এক পর্যায়ে সুভাষ এঁকেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দশিল্পরূপ—

"ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে—
খাড়া করে কান কাস্তের শান
শুনছে নাকি
কামারশালে?[২২]

পদাতিক কবি প্রশ্ন তুলছেন দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শোষণ নিয়ে—

"শানানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে সোজা জিজ্ঞাসা—
দুশো বছরের রক্ত শুষেও মেটেনি পিপাসা?"[২৩]

একই বিশ্বাসে বিপ্লবশেষে সম্ভাব্য সফলতার ঘোষণা—

"দিন আসে ভাই—
কাস্তের মুখে নতুন ফসল তুলবার।"[২৪]

—এমন বহু উদাহরণ তুলে ধরা যাবে কাস্তের সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে, নানা প্রতীকে, নানা চিত্ররূপে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে। চল্লিশের দশকের চরিত্রমাফিক, আদর্শমাফিক কাস্তে-প্রাকরণিক কাব্যপংক্তি চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যে তিরিশের দশক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন –সরাসরি বিপ্লবী সংগ্রামী ধারায়।একইভাবে অনুরূপ যুগোপযোগী কবিতাপংক্তির সন্ধান মেলে সুকান্তর রচনায়। সুভাষের কবিতায় যেখানে প্রাকরণিক উদ্ভাস আপন বৈশিষ্ট্যে, সুকান্তে সেখানে স্পষ্টতা, ঋজুতা, সরল-জটিলতাহীন শব্দবিন্যাস। সম্ভবত এ-কারণেই সমকালে সুকান্তর কবিতা অনেক বেশি পাঠকমন জয় করেছিল। সুকান্তের 'ফসলের ডাক : ১৩৫১' কবিতাটি শুরুই হয়েছে এভাবে সহজ-সরল শব্দভাষ্যে—

"কাস্তে দাও আমার এ হাতে—

সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।

--- --- --- --- --- --- ---

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে

তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্যপ্রখর—

যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।"[২৫]

কাস্তে কৃষকসমাজে ফসল কাটার অতি প্রয়োজনীয় একটি হাতিয়ার। অন্যদিকে সমাজবদলের আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী অস্ত্র।বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গন তার সর্বোচ্চ সংগ্রামী সচেতনতার কালে (যেমন বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে) কাস্তে-হাতুড়িকে নান্দনিক সৃজনশীলতায় ব্যাপক হারে ব্যবহার করেছিল, ইতিহাস তা ধরে রেখেছে যেমন কবিতায়, তেমনি গণসংগীতে। সে-পর্যায়ে গণসংগীতে কাস্তের সাংস্কৃতিক ব্যবহার ছিল অনেক বেশি ধারালো, যে-ধারা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হয়ে পূর্ববঙ্গে ষাটের দশক পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে একাধিক সাংস্কৃতিক সংগঠনে। কাস্তে তখন শ্রেণীসংগ্রামের প্রতীক, শ্রেণীশত্রু খতমের হাতিয়ার –যেমন কৃষকআন্দোলনের উগ্রতায়, তেমনি তেভাগার অনুরূপ আন্দোলনে। ধানকাটা, ফসলকাটার হাতিয়ারকে মূলত তেভাগা তথা উত্তাল কৃষকআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গণসংগীতে কাস্তেতে শান দেওয়ার আহ্বানে গণসংগীতকারদের মধ্যে সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঐতিহাসিক মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। যেমন—

"হেই সামালো, হেই সামালো

হেই সামালো ধান হো

কাস্তেটা দাও শান হো

জান কবুল আর মান কবুল

আর দেব না আর দেব না

রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো॥"[২৬]

Conclusion:

'চাঁদ-কাস্তে'র কাব্যবিচারে তুলনামূলক দৃষ্টিতে তাই বলতে হয়, তৎকালীন বিবেচনায়, দিনেশ দাসের কাস্তে স্পষ্টতায় বেয়নেটের চেয়েও ধারালো এবং তা শ্রেণীসংগ্রামের প্রত্যয় আদর্শগত চেতনায় ধারণ করে। দিনেশ দাসের কাস্তে যথারীতি সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-পৌরাণিক উপমায় কালপুরুষের তরবারি রূপ ধারণ করেছে, যদিও তিনি সেটিকে 'কাস্তে' নামেই অভিহিত করেছেন। কবিতার দোলাচলবৃত্তির মধ্যে কবি দিনেশ দাস কাস্তেকে চাঁদের উপমায় যুক্ত করে কবিতাকে সংগ্রামের ধারক-বাহক করে তোলেন। সেটা ছিল শ্রেণীসংগ্রামের শৈল্পিক প্রকাশ। চাঁদের প্রেমিক রোমান্টিকতাকে তিনি নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। যদিও সেখানে শৈল্পিক নান্দনিক রূপের প্রকাশে ঘাটতি ছিল না। চল্লিশের দশকের কবিরা এই ধারাবাহিকতায় কাস্তেকে নানা ভাষ্যে কবিতার উপজীব্য করে তোলেন।তবে কবি দিনেশ দাস চাঁদকে কাস্তের রূপ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন অভিজাত কবিমহলে, অন্যদিকে সুভাষ-সুকান্ত প্রমুখ বিপ্লবী কবিরা কাস্তেকে শ্রেণীসংগ্রামের নানা ভাষ্যে হাজির করেছিলেন। তাই সম্পূর্ণ

ভিন্ন চরিত্রের উপমা টেনে বলতে পেরেছিলেন ‘পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি’। যে-কাব্যপংক্তি একসময় পাঠকের মুখে মুখে ফিরত।

Reference:

(১) দাস, দিনেশ। (১৯৩৮)। কাস্তে, পুর্বাশা প্রকাশনী, ভূমিকা অংশ

(২) পূর্বোক্ত

(৩) বসু, বুদ্ধদেব (সম্পা.)। (২০০৭)। আধুনিক বাংলা কবিতা, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃষ্ঠা- ১৯০

(৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯১

(৫) পূর্বোক্ত

(৬) পূর্বোক্ত

(৭) কাজী, কল্যাণী (সম্পা.)। কাজী নজরুলের গান, সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা- ৩১

(৮) দাশ, জীবনানন্দ। (২০১৭)।বনলতা সেন, নিউ স্ক্রিপ্ট, পৃষ্ঠা- ১৪

(৯) বসু, বুদ্ধদেব। (১৯৫৩)। বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ-কবিতা, কঙ্কাবতী, নাভানা পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৩০

(১০) পূর্বোক্ত, আধুনিক বাংলা কবিতা, পৃষ্ঠা- ১৯১

(১১) পূর্বোক্ত

(১২) পূর্বোক্ত

(১৩) পূর্বোক্ত

(১৪) দে, বিষ্ণু। (১৯৫৯)। কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ২০৬

(১৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২০

(১৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২১

(১৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২২২

(১৮) দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। (১৯৬০)। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, দে’জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ১৮৬

(১৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৭

(২০) দাশ, জীবনানন্দ। (১৯৫৬)। ধূসর পাণ্ডুলিপি, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা- ৭৫

(২১) সেন, সমর। (২০১৬)। সমর সেনের কবিতা, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা- ৩৪

(২২) মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। (১৯৫৭)। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসমগ্র, বিশ্ববানী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ২৭

(২৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৩

(২৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭২

(২৫) ভট্টাচার্য, সুকান্ত। (১৩৬৪)। সুকান্ত-সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১

(২৬) চৌধুরী, সবিতা, চৌধুরী, অন্তরা, নিয়োগী, রণবীর (সংকলন ও সম্পাদনা)(২০১৩)।সলিল চৌধুরী রচনাসংগ্রহ, ১ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ২৯

Citation: **ভট্টাচার্য. চ.,** (2025) "চাঁদ ও কাস্তের প্রতীকে বাংলা কবিতা : কবি দিনেশ দাস ও অন্যান্যরা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.